গণতন্ত্র-সংবিধান-সংকট: দেশ কোন পথে

আবুল বারকাত
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদ
আয়োজিত গোল টেবিলে উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধ

জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা: ২৩ এপ্রিল ২০০৮

দেশ কোন পথে? দশটি প্রশ্ন

দেশ কোন পথে? আমার ধারণা এ প্রশ্নের সদুত্তর আমাদের কারো জানা নেই। কিন্তু এ কথা সত্য যে এ বিষয়ে আমাদের ভাবনা-দুর্ভাবনার সীমা নেই। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের দৈনন্দিন জীবন-জীবিকা, চারিপাশের পরিবেশ-পরিস্থিতি, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আর ইতিহাসের জ্ঞান-বুদ্ধির সম্মিলনে বিষয়টি বুঝবার চেষ্টা করছি। অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় সম্ভবত এ বিষয়ে আমাদের প্রত্যেকেরই এখন আগ্রহ বেশি। সেটারও সম্ভাব্য প্রধান কারণ দেশ নিয়ে এখন অনিশ্চয়তা অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি। কোথায় যাচ্ছে দীর্ঘ মুক্তি ও স্বাধীনতা সংগ্রামে অর্জিত আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি-বাংলাদেশ?

সাধারণভাবে বাহ্যত আমাদের দেশ-চিন্তার বিষয়গুলো এরকম:

ক. কেন এমন হলো? আসলে হলোটা কি?

খ. ক্ষমতা আসলে কার হাতে? কে চালাচ্ছে দেশ?

গ. যারা প্রকৃত দেশ চালক তারা সামনের দিনে কি করতে চান?

ঘ. দ্রব্যমূল্য কি কমবে?

ঙ. মানুষের প্রকৃত আয় কি বাড়বে?

চ. জাতীয় সংসদ নির্বাচন কি হবে? কে আসবে ক্ষমতায়? আর যারাই আসুক তারা কি আগের মতই আচরণ করবেন না'কি ধনাত্মক/জনকল্যাণকামী কোনো পরিবর্তনে হাত দেবেন?

ছ. যুদ্ধাপরাধীদের (১৯৫৭ জন) বিচার কি হবে?

জ. ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক শক্তির জঙ্গিত্ব কি বাড়তেই থাকবে? মৌলবাদের অর্থনীতির ভীত কি উত্তরোত্তর শক্তিশালী হতেই থাকবে?

ঝ. গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রক্রিয়া কি ব্যাহতই হতে থাকবে?

ঞ. স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ পরিচালনে বহিঃশক্তির খবরদারী কি বাড়তেই থাকবে?

আমার প্রশ্ন হলো ১৫ কোটি মানুষের এ দেশে যে ১০ কোটি দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত মানুষ আছেন তাদের জীবনের অধোগতি আর কত দূর নামবে; ৪ কোটি নিম্ন মধ্যবিত্ত-মধ্য-মধ্যবিত্তের জীবনে সামনের দিকটা আর কত দূর অনিশ্চিত হবে? আর লুটেরা লাখ পাঁচেক (পরিবার সদস্যসহ ২৫ লাখ মানুষ)-এরই বা কি হবে? শেষোক্ত গোষ্ঠি কি হঠাৎ দেশপ্রেমিক হয়ে যাবেন? এমন কিছু কি ঘটে যাবে যার ফলে ১৫ কোটি মানুষের এ দেশে উল্লিখিত ১৪ কোটি মানুষের জীবনে স্বস্তি ফিরে আসবে? এমন কোনো কিছু কি ঘটে যাবে যার ফলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মূল বিষয়দ্বয় অর্থাৎ বৈষম্যহীন অর্থনীতি এবং অসাম্প্রদায়িক মানস-কাঠামো বিনির্মাণ প্রক্রিয়াটি প্রতিষ্ঠিত হবে? আর এ প্রক্রিয়া বিনির্মাণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান উৎসাহিত হয়ে পড়বে।

জরুরি অবস্থা: সংবিধানের বিধান ও বাস্তব অবস্থা

দেশে জরুরি অবস্থা জারী হলো কেন? কি যুক্তিতে? কার স্বার্থে? কি লক্ষ্যে? লাভ হলো কার? এসব প্রশ্নেরও সম্ভাব্য সঠিক উত্তর আমাদের খুব জানা আছে– মনে হয় না। সংবিধান বলছে *"প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ"* [অনুচ্ছেদ ৭(১)]। অথচ বাস্তব অবস্থাটা এমনই যখন এ প্রশ্ন অমূলক হবে না যে দেশে আসলে প্রজাতন্ত্র চালু আছে না'কি এক ধরনের রাজতন্ত্র চলছে। সংবিধান এও বলছে যে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির কাছে সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হতে হবে যে *"এমন জরুরি-অবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহাতে যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশ বা উহার যে কোনো অংশের নিরাপত্তা বা* ***অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন****"* (অনুচ্ছেদ ১৪১ ক/১)। আমি প্রশ্নটি উত্থাপন করছি এ জন্য যে এমনকি সরকারি তথ্য-উৎস অনুযায়ীই জরুরি অবস্থার আগের তুলনায় জরুরি অবস্থার পরে দেশের অর্থনৈতিক জীবন অধিকতর বিপদের সম্মুখীন হয়েছে (সারণি ১ দেখুন)। আমি প্রশ্নটি উত্থাপন করছি আরো এ কারণে যে অর্থনৈতিক জীবনের বিপদের প্রকৃতি ও মাত্রা এখন এমনই দাঁড়িয়েছে যা থেকে পরিত্রাণের পথ-নির্দেশনা দেয়া কঠিন।

সারণি ১: জরুরি অবস্থার পূর্বে ও পরে অর্থনৈতিক অবস্থা

অর্থনৈতিক নির্দেশক	জরুরি অবস্থার পূর্বে	জরুরি অবস্থার পরে
জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (মোট) (স্থীর মূল্যে; ১৯৯৫-৯৬ ভিত্তি বছর)	৭.০২ (জুলাই ২০০৫-জুন ২০০৬)	৬.৭৭ (জুলাই ২০০৬-জুন ২০০৭)
বাণিজ্য ভারসাম্য (কোটি ডলারে)	-১৩৩.৪ (জুলাই ২০০৬-ডিসেম্বর ২০০৭)	-২২২.৬ (জুলাই ২০০৭- ডিসেম্বর ২০০৮)
মূল্যস্ফীতি		
(পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ১২ মাস): মোট	৫.৯৪	১১.৪৩
খাদ্য	৬.৬৫	১৪.২০
খাদ্য বহির্ভূত	৪.৯৫ (জানুয়ারী ২০০৭)	৭.২১ (জানুয়ারী ২০০৮)
খাদ্য পরিস্থিতি: (লাখ মেট্রিক টন)		
সরকারি ক্রয় (চাল, গম)	৬.৮৬	২.৬৭
মজুত (চাল, গম)	৭.১৫ (জুলাই ২০০৬-জানুয়ারী ২০০৭)	৬.৬৯ (জুলাই ২০০৭-জানুয়ারী ২০০৮)
সরকারি ঋণ: ব্যাংক থেকে (কোটি টাকায়)	৫৪৫৩.৫০ (জুলাই ২০০৬-জানুয়ারী ২০০৭)	৭৯৩৪.৭০ (জুলাই ২০০৭-জানুয়ারী ২০০৮)
সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (কোটি ডলারে)	৪১১ (জুলাই ২০০৬-ডিসেম্বর ২০০৭)	৩৬৮ (জুলাই ২০০৭-ফেব্রুয়ারী ২০০৮)

তথ্য উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৭ (অর্থ মন্ত্রণালয়); বাংলাদেশ ব্যাংক (Monthly Update, March 2008)

সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ীই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা জরুরি অবস্থার আগের তুলনায় জরুরি অবস্থার পরে খারাপ হয়েছে। আসলে অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট বাস্তব অবস্থা সরকারি পরিসংখ্যান যা বলছে তার চেয়ে অনেক বেশি খারাপ। কারণ আমাদের দেশে দু'ধরণের অর্থনীতি আছে– একটি "পরিসংখ্যানিক অর্থনীতি" (statistical economy অর্থাৎ সরকারি ভাষ্যের অর্থনীতি), আর একটি "বাস্তব অর্থনীতি" (real economy)। এ দু'য়ের প্রভেদ– নির্বাচিত-অনির্বাচিত সরকার নির্বিশেষে– সমভাবে প্রযোজ্য। সরকার মাত্রেই "মিথ্যাশ্রয়ি", "অস্বচ্ছ", "সত্য স্বীকারে সৎসাহসহীন প্রতিষ্ঠান", "দুর্বল", "দুর্নীতি সহায়ক", "পরনির্ভর", "আন্তর্জাতিক পুঁজি, কর্পোরেট পুঁজি এবং তাদের স্বার্থবাহী প্রতিষ্ঠানের উপর অতি নির্ভর"– এসব কারণেই সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তির ব্যক্তিগত সৎগুণাবলী (অনেকেরই হয়তো বা আছে) গৌণ আর তাদের কাছে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠি দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের স্বার্থ প্রজাতন্ত্রে রাজার কাছে প্রজার স্বার্থ সমতুল্য হতে বাধ্য।[১]

সংবিধান মতে *"অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখিন"* হলে জরুরি অবস্থা জারী করা যেতে পারে (তবে এ ঘোষণার আগে **রাষ্ট্রপতির কাছে** অবস্থাটি **সন্তোষজনকভাবে** প্রতীয়মান হতে হবে)। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেই যে প্রধানত রাজনৈতিক দলসমূহের হৈ-হুল্লোড়ের কারণে দেশের "অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখিন" হয়ে গিয়েছিলো সেক্ষেত্রে এ কথা বলা তো যুক্তিহীন হবে না যে জরুরি অবস্থা ঘোষণার পরে অর্থনৈতিক জীবন বিপদমুক্ত হবে। সরকারি পরিসংখ্যানই তো বলছে যে জরুরি অবস্থার পূর্বের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপদসঙ্কুল হয়ে থাকলে জরুরি অবস্থার পরে ঐ বিপদ বেড়েছে এবং তা উত্তরোত্তর বাড়ছে। এ ক্ষেত্রে এ দেশের একজন নাগরিক হিসেবে আমার প্রশ্ন যারা জরুরি অবস্থার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তারা (কারা আমি জানি না) কি এটা জেনেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে জরুরি অবস্থার পরে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অধিকতর ঝুঁকির মধ্যে পড়লেও কিছু আসে যায় না? না'কি তারা বুঝতেই পারেননি – অর্থনৈতিক অবস্থাটা আরো খারাপ হবে? না'কি তারা cost-benefit তত্ত্বানুযায়ী মনে করেছিলেন everything has a cost এবং সে cost যদি জনকষ্ট বাড়ায় তাতে সমস্যা নেই? আলু-ভর্তার এ অর্থনীতি (!) আমার কাছে দুর্বোধ্য।[২]

দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থা (real economy) – সরকার যা বলছেন (statistical economy) তার চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহ। আমার হিসেবে গত দেড় বছরে নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের দ্রব্যমূল্য পণ্যভেদে বেড়েছে ৩০ শতাংশ থেকে ৩০০ শতাংশ পর্যন্ত। নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের গড় মূল্যস্ফীতি হয়েছে ৪০-৫০ শতাংশ (অবশ্য সরকার বলছেন সর্বোচ্চ ১২ শতাংশ!)। বাংলাদেশের ইতিহাসে মূল্যস্ফীতির এ এক অনন্য রেকর্ড। অবস্থা দাঁড়িয়েছে এমনই যে ১৫ কোটি মানুষের দেশে এখন প্রায় ১০ কোটি মানুষই বছরের কোন না কোন সময় খাদ্য সংকটে ভুগছেন; প্রায় ৭ কোটি মানুষ সারা বছরই খাদ্য সংকটে আছেন; আর ৩-৪ কোটি মানুষ পরের বেলায় খাবার পাবেন কি পাবেন না এ নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকেন এবং সম্ভবত বছরের কখনোই তিন বেলা খাবার পান না (তারা কি যে খান-এ প্রসঙ্গ বাদই দিলাম)। এ অবস্থা নিঃসন্দেহে "গোপন ক্ষুধা" নয়, "নীরব দুর্ভিক্ষ"ও নয়– সরব দুর্ভিক্ষের সরাসরি প্রতিফলন। ক্ষুধার্ত, অভুক্ত, অর্দ্ধভুক্ত, অনাহারক্লিষ্ট, দুর্দশাগ্রস্ত, বঞ্চিত এসব মানুষই এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ (কমপক্ষে প্রতি ৩ জনের ২ জন)। এদের মধ্যে আছেন

---

[১] এসব কারণেই সরকারি এক কর্মকর্তার সাথে আদিবাসী এক সাওতাল নারীর কথোপকথন নিয়ে মহাশ্বেতা দেবী লিখেছেন (সাওতাল নারী বলছেন) "তুই সরকার যদি এতই ভালো হবি তাহলে আমার অবস্থা এতো খারাপ কেনো"? হুবহু এ ধারণাটি আমাদের দেশের জন্য সমান প্রযোজ্য।

[২] কৃষক এবার আলু নিয়ে দু'দফা বিপদে পড়েছে। প্রথমে চাষের আগে সার কালোবাজারীদের খপ্পড়ে। আর এখন বাম্পার ফলন-এর ফলে আলু পঁচে যাচ্ছে– কৃষকের মাথায় বাড়ি।

ভূমিহীন-প্রান্তিক কৃষক, কর্মচ্যুত মানুষ, গ্রাম-শহরের নারী প্রধান খানা, বেকার মানুষ, ভাসমান মানুষ, বস্তির মানুষ, ভিক্ষুক মানুষ, বয়োবৃদ্ধ মানুষ, শিশু-মানুষ, চরের মানুষ, হাওর-বাওরের মানুষ, জলাবদ্ধ মানুষ, উপকূলের দুর্যোগগ্রস্ত মানুষ, রিক্সা-ভ্যান-ঠেলাগাড়ী চালক মানুষ, অনানুষ্ঠানিক সেক্টরের সব মানুষ, আদিবাসী মানুষ, নিম্নবর্ণ-দলিত সম্প্রদায়ের মানুষসহ সকল প্রান্তিক মানুষ। যদিও সংবিধান অনুযায়ী জনগণই হইবেন প্রজাতন্ত্রের মালিক তথাপি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ এসব মানুষকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা না করাটাই কেন যেন নিয়মে রূপান্তরিত হয়েছে। আর এ নিয়মের কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি বর্তমান জরুরি অবস্থাতেও। বরঞ্চ এসব মানুষের একাংশকে 'উন্নয়ন শৃংখলা' প্রতিষ্ঠার নামে তাদের জীবন-জীবিকার কথা বিবেচনা না করেই উচ্ছেদ করা হয়েছে। অথচ **কাজের অধিকার** এ দেশে মানুষের সাংবিধানিক অধিকার।

প্রকৃত অবস্থাটা আসলে আরো মারাত্মক। বিপদসংকুল। দ্রব্যমূল্য বাড়লে তেমন ক্ষতি নাও হতে পারে যদি দ্রব্যমূল্য বাড়ার হারের (গতির) চেয়ে মানুষের প্রকৃত আয় বাড়ার হার (গতি) বেশি হয়– এ এক সাধারণ জ্ঞানের বিষয় (এটা বুঝতে অর্থনীতিবিদ হবার কোনো প্রয়োজন পড়ে না)। প্রকৃত সত্য হলো গত দেড় বছরে (অর্থাৎ জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর) দেশের ১৫ কোটি মানুষের মধ্যে ১৪ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষের (অর্থাৎ ৯৭ ভাগ মানুষের) প্রকৃত আয় বাড়েনি– কমেছে।

দেশে বেকার মানুষের সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান– যাদের মধ্যে আছে পুরো বেকার, অর্দ্ধবেকার, ছদ্মবেকার ইত্যাদি। আমার হিসেবে দেশে এখন ৪ কোটি কর্মক্ষম (যাদের সরকারি ভাষায় active labour force বলা হয়) মানুষ বেকার; কর্মহীন। কিছুটা জরুরি অবস্থা আর কিছুটা সরকারি ভ্রান্ত নীতির কারণে ছোট-মাঝারি-বড় মিলে গত এক বছরে দেশে আনুমানিক ৫০ হাজার শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েছে এবং ৫০ হাজার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সংকুচিত হয়েছে অথবা বন্ধ হবার উপক্রম– এসব কারণে কমপক্ষে এক কোটি শ্রমজীবী-কর্মজীবী মানুষ বেকার হয়েছেন। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হকার উচ্ছেদ ও দোকানপাট উচ্ছেদও কমপক্ষে ২০ লাখ মানুষকে বেকার করেছে। নির্মাণ শিল্প খাতে ধস-এর কারণে এ খাতে এখন ৭০-৮০ লাখ মানুষ কর্মহীন। বার্ড ফ্লু-র কারণে (যা বেশ দুর্বোধ্য বিষয়) ১০,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগকারী পোলট্রি শিল্পে ৫০ লাখ কর্মজীবী মানুষ বেকার হয়েছেন। ঘুর্ণিঝড় ও সিডর বেকার করেছে কমপক্ষে ৫০ লাখ মানুষকে। প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পসহ বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে প্রধানত জরুরি অবস্থা উদ্ভুত "ভীতি ফ্যাক্টরের" কারণে বিনিয়োগ আগ্রহ হ্রাসের ফলে গত এক বছরে নতুন কর্মসংস্থান ঘটেনি– বিঘ্নিত হয়েছে কমপক্ষে ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান। আর সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অতি-ধীর বাস্তবায়নের কারণে (যেটাও ভীতিউদ্ভুত কারণ-সংশ্লিষ্ট) কমপক্ষে ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান ব্যাহত হয়েছে। আর দেশের অর্ধেক কর্মসংস্থান সরবরাহকারী খাত কৃষিতে এমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি যার ফলে নতুন কর্মসংস্থান হয়েছে– আসলে কৃষিতেও বেকারত্ব বেড়েছে। শহরের মধ্যবিত্ত মানুষ নতুন কাজ পায়নি– গত ১-১.৫ বছরে। সুতরাং সাড়ে ১৪ কোটি মানুষের প্রকৃত আয় হ্রাস পেয়েছে এবং কমপক্ষে ৪ কোটি মানুষ এখন সরাসরি বেকার (অবশ্য সরকার বলে ২২ লাখ!)।

তাহলে দাঁড়ালোটা কি? যে সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে– অন্তত সাংবিধানিক দৃষ্টিতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হলো অর্থাৎ ***"অভ্যন্তরীণ গোলযোগের*** *দ্বারা বাংলাদেশ বা উহার যে কোনো অংশের* ***নিরাপত্তা*** *বা* ***অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখিন"*** – সে সমস্যা সমাধান তো হলোই না বরঞ্চ সমস্যা বাড়লো এবং কয়েকগুণ। দ্রব্যমূল্য অতীতের সকল রেকর্ড ছাড়ালো, বেকারত্ব বৃদ্ধি পেলো, মানুষের প্রকৃত আয় হ্রাস পেলো, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় "ভীতি ফ্যাক্টরের" কারণে আস্থা হারিয়ে বিনিয়োগে আগ্রহ হারালো ইত্যাদি। আর পাশাপাশি দেশের "নিরাপত্তা" নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "গোলযোগকারী"-দের গোলযোগ হ্রাসে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ/স্থগিত করা হলো, মুক্তিযুদ্ধ সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামকে 'বদ্ধ ঘরে' মুক্তিযুদ্ধের দেশ-চেতনা বিষয়ক আলাপ আলোচনা করার সুযোগও বিলম্বিত/রহিত করা হলো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত ডিন এবং

শিক্ষক সমিতির নির্বাচিত সভাপতি-সাধারণ সম্পাদককে এরেস্ট করে জেলে নেয়া হলো, জেলে নেয়া হলো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এবং বেনামি ৮৫ হাজার মানুষকে আসামী করা হলো– বলা হলো এরা সবাই ষড়যন্ত্রকারী, অথচ একই সময়ে একই জরুরি অবস্থার মধ্যেই মুক্তিযুদ্ধের শত্রু এবং যুদ্ধাপরাধীদের প্রতিনিধিরা সদর্পে প্রকাশ্যে বলতে থাকলে এ দেশে কোনো মুক্তিযুদ্ধ হয়নি– হয়েছিল "বিচ্ছিন্নতাবাদী গোলযোগ"; বলতে থাকলো মুক্তিযোদ্ধারা "চোর-ডাকাত-হাইজ্যাকার-নারী লিপ্সু" ইত্যাদি; এবং তারা সবশেষে সংবিধানে বিধৃত "নারী-পুরুষের সমানাধিকার"এর বিরুদ্ধে জঙ্গী কায়দায় প্রকাশ্যে মাঠে নামলো– এমনকি পুলিশের স্টেনগান ছিনিয়ে নিয়ে পুলিশকে পেটালো এবং এত কিছুর পরেও জরুরি অবস্থার তত্ত্বাবধায়ক/অন্তর্বর্তীকালীন সরকার (!) নারী নীতি বিষয়ে তাদেরই প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠন করলেন 'নারী-নীতি পর্যালোচনা কমিটি'। যে কমিটি সরকারের কাছে রিপোর্ট দিয়ে বলেছে ঐ নীতিতে 'সমানাধিকার' বলে কিছু থাকতে পারবে না (তাদের ভাষায় হবে "ন্যায্য অধিকার"); সংবিধানে যাই থাকুক না কেন "কুরআন-সুন্নাহ" পরিপন্থি কিছুই থাকতে পারবে না, এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র কর্তৃক স্বাক্ষরিত সিডও সনদ গ্রহণযোগ্য নয়। এহেন অবস্থায় একজন নাগরিক হিসেবে আমি কি ভুল বলবো যদি বলি মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ধর্মীয় উগ্র এসব সাম্প্রদায়িক শক্তিই হলো আসলে গোলযোগ সৃষ্টিকারী, তারাই নিরাপত্তা বিঘ্নিতকারী, তারা বিগত ৩৬ বছরে এ দেশে মূলধারার অর্থনীতির মধ্যে সৃষ্টি করেছেন "মৌলবাদের অর্থনীতি" (যেখানে বছরে ১২০০ কোটি টাকার নীট মুনাফা সৃষ্টি হয়) এবং তার উপর ভিত্তি করেই "রাষ্ট্রের মধ্যেই ভেতরে-ভেতরে তারা আরেকটি রাষ্ট্র" সৃষ্টি করেছে; এবং রাষ্ট্রের এমন কোনো যন্ত্রাংশ নেই যেখানে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় নয়! তারা তো বাংলাদেশের সংবিধানই মানেন না– যে সংবিধানে অতীতের সেনাশাসকেরাই কেটেকুটে যথেষ্ট মাত্রায় 'ইসলামীকৃত' করেছেন। তারা তো প্রকাশ্যেই বলেন তাগুদি আইন (অর্থাৎ মানুষের তৈরি আইন) মানি না, দেশ চলতে হবে আল্লাহ্‌র আইনে। আর এসব কথাবার্তা সম্বলিত লিফলেটটি ১৭ আগস্ট ২০০৫ সালে তারা যখন একই সময়ে দেশের ৬৩ জেলায় বোমাবাজি করে তখন বিলি করেছিলো। এসব বিশ্লেষণপূর্বক আমার প্রশ্ন– তাহলে রাষ্ট্র-সরকার-গণতন্ত্র এখন কে/কারা হেফাজত করছে? মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণকারীরা না'কি মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধ শক্তি?

কে চালাচ্ছে দেশ? চালকের আসনে কে?

আসলে দেশ চালাচ্ছে কে? কোন গোষ্ঠি? কার স্বার্থে? কোন লক্ষ্যে? প্রকৃত চালকের আসনে যারা আছেন তারা কি দেশের ভিতরেই আছেন না'কি বাইরের নির্দেশে চলছে দেশ? এসব প্রশ্নের সুদত্তর নিয়ে আমরা খুব পরিষ্কার– আমার তা মনে হয় না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একজন অতি উৎসাহী মুখর প্রাক্তন উপদেষ্টা বললেন বর্তমান সরকার "সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার"। উত্তরে সেনা প্রধান বললেন এ ফর্মুলেশন ভুল; তার মতে ঠিকটা হলো "সেনাবাহিনী রাষ্ট্রের অংশ এবং সেনাবাহিনীর দায়িত্ব সরকারকে সহযোগিতা করা"। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন এ বছরের ডিসেম্বর নাগাদ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সেনাবাহিনী সর্বাত্মক সহযোগিতা দিবে– এ জন্য তিনি সেনাপ্রধানকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। সেনাবাহিনী এখন কার্যত সিভিল প্রশাসনের অনেক দিক দেখভাল করছে। এ নিয়ে সিভিল প্রশাসনও খুশী নয়। বাজারের কিছু দায়িত্ব নিয়েছে বিডিআর। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান এবং সেনাপ্রধান উভয়েই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘুরে এসেছেন। এ ঘোরাঘুরির প্রয়োজন জনগণ বুঝেনি। সাংবিধানিক কোর্ট হাইকোর্টের রায়কে আপিল বিভাগ কিভাবে বাতিল করলো– তাও বুঝলাম না (সম্ভবত এটা সংবিধানের ৩৫ (১) অনুচ্ছেদের পরিপন্থি)। বিদেশী রাষ্ট্রদূতরা– বিশেষত: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও যুক্তরাজ্যের– এ দেশ নিয়ে এত বেশি ভাবছেন যতবেশি আমরাও ভাবি না। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এশিয়ান ডেভেলপম্যান্ট ব্যাংকসহ বিদেশী গ্যাস-কয়লা উত্তোলন সংশ্লিষ্ট কোম্পানি এবং তাদের এজেন্টরা কেন যেন বাংলাদেশ নিয়ে অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় অতি মাত্রায় আগ্রহী! বঙ্গোপসাগরে তেল-গ্যাস উত্তোলন নিমিত্ত পিএসসি চুক্তি স্বাক্ষরে বর্তমান অনির্বাচিত সরকারের আগ্রহের শেষ নেই। বাংলাদেশ বিমানকে বহু টাকার বিমান ক্রয়ের

জন্য (তাও সোভেরিন গ্যারান্টিসহ) ২০১৭ সাল নাগাদ চুক্তিবদ্ধ হওয়াকে এ দেশের সিভিল এভিয়েশনের নতুন দিগন্ত হিসেবে সার্টিফিকেট প্রদান করেছে মার্কিন দূতাবাস। আমাদের রাজনীতিবিদরা কি নিয়ে সংলাপ করবেন অথবা কি নিয়ে করলে ভাল হয় এসব বুদ্ধিও দিচ্ছেন তারাই। আমার প্রশ্ন আমার দেশ আমাদের চেয়ে ওরা বেশি বোঝে– এ কেমন কথা?

মনে রাখা দরকার যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ কিন্তু ১৯৭১ সালেও এ দেশ নিয়ে বেশি বুঝে ফেলেছিলো। সে কারণেই বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধকে তারা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বলতে কুণ্ঠিত হননি; সরাসরি সহযোগিতা করেছিলো মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তিকে; এমনকি বিশ্বাসঘাতক জনাব মোশতাকের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ শক্তিকেও "বিভক্ত করে শাসন করো" পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলো। শেষ রক্ষা হয়নি। কোনোই লাভ হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ সাম্রাজ্যবাদীদের, পাকিস্তানী সেনা শাসকদের এবং তাদের দালাল আলবদর-আলশামস–রাজাকারদের বিরোধীতার মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। তবে এরপরও কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ আমাদের ছাড় দেয়নি– মুক্তিযুদ্ধের পরে কিসিঞ্জার সাহেব বললেন "বাংলাদেশ হলো তলাবিহীন ঝুড়ি"; আর বিশ্বব্যাংক জোর-জবরদস্তি করতে থাকলো যে পাকিস্তান বিশ্বব্যাংক থেকে ১৯৭১ অবদি যে ঋণ নিয়েছিলো জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে বাংলাদেশকে তা পরিশোধ করতে হবে; ১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য নিয়ে রাজনীতিটাও করলো তারাই– বললো কিউবায় পাট বিক্রি করলে খাদ্য সাহায্য দেয়া হবে না, খাদ্যের জাহাজ উল্টো পথে ফেরত গেলো; আর ইদানিং তারা প্রকাশ্যে তাদের ইচ্ছা জানিয়ে দিয়েছে যে বাংলাদেশকে তারা মডারেট মুসলিম স্টেট হিসেবে দেখতে ইচ্ছুক (অথচ 'সেকুলারইজম' আমাদের মূল সংবিধানের চার প্রধান ভিত্তির অন্যতম ভিত্তি)। সুতরাং যুক্তি পরম্পরা এটাই নির্দেশ করে যে ওরা আমাদের সেক্যুলার রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে ইচ্ছুক নন আবার একই সাথে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠিও বাংলাদেশকে পুরোপুরি আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাস্তান হিসেবে প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশ নিয়ে এ দেশের স্বাধীনতার বিপক্ষ দুই শক্তির স্বার্থের অপূর্ব এ মিলন থেকে আমার ধারণা বাংলাদেশ নিয়ে প্রকাশ্য ষড়যন্ত্রের শুরুটা ১৯৭১ সাল থেকেই। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং তাদের প্রতিনিধি সংস্থারা চায়নি এদেশ স্বাধীন হোক; আমাদের মধ্যের তাদের এজেন্টরাও (জনাব মোস্তাকসহ তার পদলেহীরা) চায়নি এদেশ স্বাধীন হোক; পাকিস্তানী সেনা শাসক এবং তাদের এজেন্টরাও চায়নি এ দেশ স্বাধীন হোক। ধর্মনিরপেক্ষতা (অসাম্প্রদায়িকতা)– জাতীয়তাবাদ-গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে বাংলাদেশ নামে একটি রাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করবে এবং পৃথিবীতে প্রগতির শক্তি বৃদ্ধি পাবে– এ তাদের পছন্দ হয়নি। মতাদর্শগতভাবেই তা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবার কথা নয় এবং হয়নি। আমার ধারণা সে কারণেই তারা কৌশল নিলো "ভেতর থেকে দূর্গ ভাঙ্গার"। এসব তারা করছিলো তখন যখন আমরা স্বাধীন হয়েছি মনে করে যথেষ্ট আত্মতৃপ্ত ও আত্মতুষ্ট হয়ে পড়েছিলাম।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পরিবার পরিজনসহ নৃশংসভাবে হত্যার মাধ্যমে তাদের প্রধান প্রথম সাফল্য আসলো। তার পরের সফলতা জেল খানায় জাতীয় চার নেতা– জনাব তাজদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মুনসুর আলী এবং জনাব কামরুজ্জামানকে– হত্যার মাধ্যমে। তখন থেকেই শুরু হলো প্রত্যক্ষ সেনাশাসন যে সেনাশাসক একদিকে বিভিন্ন অছিলায় হত্যা করলো সেনাবাহিনীর বহু সদস্যদের যাদের প্রায় ১০০ ভাগই ছিলো সরাসরি মুক্তিযোদ্ধা; যে সেনাশাসক "বাঙালী জাতীয়তাবাদ" কনসেপ্টটিই সংবিধান থেকে উড়িয়ে দিলো; যে সেনাশাসক বললো "মানি ইজ নো প্রবলেম" এবং "রাজনীতিবিদদের জন্য রাজনীতি করা আমি কঠিন করে ছাড়বো"; যে সেনাশাসক মুক্তিযোদ্ধাদের নির্মম ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলালেন; যে সেনাশাসক নিজেই রাজনৈতিক দল গঠন করে বসলেন; যে সেনাশাসক সংবিধানের 'সমাজতন্ত্র' ভিত্তিকে উড়িয়ে দিয়ে বললেন "অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার অর্থে সমাজতন্ত্র" (যার অর্থ কেউই বোঝে না); যে সেনাশাসক পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী অশান্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে হেন কর্মকাণ্ড নেই যা করলেন না; যে সেনাশাসক যুদ্ধাপরাধীদের প্রধান নেতার নাগরিকত্ব পোক্ত করে দিলেন; এবং সর্বোপরি যে সেনাশাসক বাংলাদেশের সংবিধান থেকে এদেশ সৃষ্টির

অন্যতম ভিত্তি “সেক্যুলারইজম” বাতিল করে সংবিধানের “বিসমিল্লাহকরণ” (১৯৭৮) করে বাংলাস্তানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করলেন যা পরবর্তী সেনাশাসক সংবিধানে “ইসলাম হইবে রাষ্ট্র ধর্ম” সংযোজন করে (১৯৮৮) বাংলাস্তানের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করলেন। তখন থেকেই বাংলাদেশ হয়ে গেলো আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাস্তান।

বঙ্গবন্ধু হত্যা পরের ঐ সেনাশাসক কিন্তু ছিলেন আনুষ্ঠানিক অর্থে মুক্তিযোদ্ধা। বলে রাখা প্রয়োজন যে মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালের গত ৩৬ বছরের ইতিহাস বিশ্লেষণে এ কথা বলা সম্ভবত অত্যুক্তি হবে না যে, এ দেশে মুক্তিযোদ্ধাদের দু’ভাগে বিভক্ত করা যায়– একভাগ (যারা বেশিরভাগ) হলেন “স্বেচ্ছায় মুক্তিযোদ্ধা” (Freedom Fighter by Choice) আর অন্যভাগ (যারা সংখ্যায় স্বল্প) হলেন “ঘটনাচক্রে মুক্তযোদ্ধা” (Freedom Fighter by Chance)। পরবর্তীকালের বাংলাদেশের পুরো ইতিহাসটিই মোটামুটি বলা যায় “ঘটনাচক্রে মুক্তিযোদ্ধা” এবং তাদের মতাদর্শিক দোসরদেরই যুগ। সুতরাং আজকের বাংলাদেশে যে অধোগতি দেখা যাচ্ছে তার বড় অংশের দায়-দায়িত্ব তাদের মুরুব্বীদেরসহ তাদেরকেই নিতে হবে। এক্ষেত্রে অন্যথা হবে উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপানো।

এদেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ইতিহাসের এ প্রেক্ষাপট থেকেই আমার প্রশ্ন– আসলে দেশ পরিচালকের আসনে কে আছেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার? সেনাবাহিনী (সম্ভবত: সঠিক হবে যদি বলি একাংশ)? বিদেশী শক্তি? আমাদের বিষয়ে অতি আগ্রহ আর বিভিন্ন ধরণের দৌড়-ঝাপ, আদেশ-নির্দেশ, সর্ববিষয়ে জ্ঞানের আধার দেখে আমার মনে হয় যে, যে বিদেশী শক্তি এ দেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনার (অর্থাৎ ৭২-এর সংবিধানে বিধৃত চার মূল স্তম্ভ) বিরুদ্ধে ছিল তারাই এখন মূলে আছেন, আর তাদের নির্দেশ পালন করছে তত্ত্ববধায়ক সরকার এবং তা সেনাশাসনের সক্রিয় মধ্যস্থতায়। আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান লঙ্ঘন করে রাষ্ট্রপতি যখন একই সাথে প্রধান উপদেষ্টা হয়ে গেলেন– এটাও হয়েছে ওদেরই নির্দেশে। এদেশের বিগত ৩৭ বছরের ইতিহাস আর বর্তমান জটিল অবস্থা দেখে আমার এও মনে হচেছ যে যেহেতু ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নেয়াটাই এখানে নিয়মে রূপান্তরিত হয়েছে সেহেতু “ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হবে” যদি মূল-মুরুব্বীরা চান। আর তা যদি ঘটেই যায় সেটা হবে এদেশের ইতিহাসে সবচে অনাকাঙ্খিত ঘটনা। কারণ সঠিক অর্থে রাষ্ট্র পরিচালনা– এটা রাজনীতিবিদদেরই কাজ যেখানে অন্যেরা সক্রিয় সহযোগি ভূমিকা পালন করে। আমি আশা করবো সেনাপ্রধানসহ সেনাবাহিনীর নীতি নির্দ্ধারকরা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, রাজনীতিবিদ এবং নাগরিক সমাজের দেশপ্রেমিক ব্যক্তি/গোষ্ঠি বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবেন। অন্যথায় বড় মাপের বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে পড়তে পারে।

কেন এমনটি হলো? যা বলা হয় আর যা আসল সত্য

বৈষম্যহীন অর্থনীতি আর অসাম্প্রদায়িক মানস কাঠামো প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন-আকাঙ্খা নিয়ে আমরা যে মহান মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম তা আদৌ বাস্তবায়িত হয়নি। গত তিন দশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রেখে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। আমার মতে **১৯৭২-এর সংবিধানের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে দেশের মাটি থেকে উত্থিত উন্নয়ন দর্শন বিনির্মাণ ও তা বাস্ত বায়নে** (home grown development philosophy) **ব্যর্থতাই সামগ্রিক ব্যর্থতার প্রধান কারণ**। আজকের সংকটাবস্থা এ ব্যর্থতারই পুঞ্জিভূত রূপ।

১৯৭২-এর মূল সংবিধানের মূল স্পিরিট (চেতনা) যা “সংবিধানের প্রাধান্য” অনুচ্ছেদে বিধৃত অর্থাৎ *“প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে” [অনুচ্ছেদ ৭(১)]’* এবং *“জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং*

অন্য কোনো আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে" [অনুচ্ছেদ ৭(২)]– **গত তিন দশকের সরকারেরা বিশেষত সেনাশাসিত সরকারেরা লঙ্ঘন করেছেন।** একজন তো স্ব-স্বার্থে সংবিধান তিনবার সংশোধন করেছেন। লঙ্ঘিত হয়েছে "*প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র*, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে" সম্বলিত সাংবিধানিক বিধি (অনুচ্ছেদ ১১)। ব্যপকভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে সংবিধানে বিধৃত রাষ্ট্রপরিচালনের মূলনীতির ১৫ অনুচ্ছেদ যেখানে স্পষ্টভাবে বলা আছে *"রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিক মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়:*

ক. অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক ব্যবস্থা;

খ. কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থান নিশ্চয়তার অধিকার;

গ. যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার; এবং

ঘ. *সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার... ।"*

সংবিধানের তৃতীয়ভাগে বর্ণিত **"মৌলিক অধিকার"** লঙ্ঘন নিয়মে রূপান্তরিত হয়েছে। *"সুযোগের সমতা"* (অনুচ্ছেদ ১৯) নিশ্চিত করার কাজটি কেউই আমল দেননি। এসবই দেশকে ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংকটের দিকে নিয়ে যেতে বাধ্য করেছে। রাষ্ট্র-সরকার পরিচালকেরা এ জন্য দায়ী– জনগণ নয়।

আর সর্বোপরি বাস্তব রাষ্ট্র-সরকার পরিচালনায় সর্বোচ্চ মাত্রায় সংবিধানের যে ধারাটি একদম উল্টে ফেলা হয়েছে তা হলো **মালিকানার নীতি** (অনুচ্ছেদ ১৩) যেখানে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে *"উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বণ্টন প্রণালীসমূহের* ***মালিকানা বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ*** *এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে: (ক)* ***রাষ্ট্রীয় মালিকানা*** *অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্টু ও গতিশীল* ***রাষ্ট্রায়ত্ব সরকারি খাত*** *সৃষ্টির মাধ্যমে* ***জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা; (খ) সমবায়ী মালিকানা,*** *অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা; এবং (গ)* ***ব্যক্তিগত মালিকানা,*** *অর্থাৎ* ***আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা"***। সংবিধানের "রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি" ভাগে বিবৃত মালিকানার নীতিকে আমাদের গত তিনদশকের রাষ্ট্র-সরকার পরিচালকেরা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেছেন এবং সেটাও করেছেন প্রজাতন্ত্রের মালিক যে জনগণ তাদের কোনোরকম অনুমতি ছাড়াই। আসলে রাষ্ট্র-সরকার পরিচালকেরা যে অগণতন্ত্রী অথবা স্বৈরাচারি আচরণ করে আসছেন–সংবিধানে নির্দেশিত "মালিকানা নীতি" বর্জন তো তারই সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। বিপরীতে বর্তমান সরকারসহ বিগত তিন দশকের সকল সরকার সংবিধানে বিধৃত মালিকানার নীতির প্রধান নীতি অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় মালিকানা বর্জন করেছেন, দ্বিতীয় প্রধান নীতি অর্থাৎ সমবায়ী মালিকানা গুরুত্বই দেননি, আর তিন নম্বর নীতি অর্থাৎ **ব্যক্তিগত মালিকানা** বিষয়টিকে **অর্থনৈতিক উন্নয়ন দর্শনে প্রধান নীতি হিসেবে স্থান দিয়েছেন**। ফলে গত তিন দশকের শাসকেরা "সংবিধানের প্রাধান্য" সংশ্লিষ্ট ধারাটিই (অনুচেছদ ৭) লঙ্ঘন করে জনগণের অভিপ্রায়কে মূল্যহীন করে ফেলেছেন। এসবের নীট ফল দাঁড়িয়েছে এরকম যে গত তিন দশকের শাসকগোষ্ঠি বিশেষত স্বৈরাচারী সেনা শাসকেরা সংবিধানে নির্দেশিত জনক্যলাণকামী উন্নয়ন দর্শনের বিপরীতে দাঁড় করিয়েছেন সাম্রাজ্যবাদ-দাতা নির্দেশিত মুক্তবাজার অর্থনীতির নয়া-উদারবাদী (neo-liberalism) উন্নয়ন দর্শন। যে দর্শন ভিত্তিগতভাবেই একদিকে সংবিধানের নির্দেশ ও মূল চেতনা বিরোধী আর অন্যদিকে তা দরিদ্র-বান্ধব নয়– জনকল্যাণবিমুখ।

আমি মনে করি সংবিধান-বিরুদ্ধ এ 'উন্নয়ন' দর্শন গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলেই বেড়েছে আয় বৈষম্য, বেড়েছে আয়ের দারিদ্র, বেড়েছে কর্মহীনতা উদ্ভুত দারিদ্র, বেড়েছে প্রকৃত মজুরী স্বল্পতার দারিদ্র, বেড়েছে ক্ষুধার দারিদ্র, বেড়েছে আবাসনের দারিদ্র, বেড়েছে শিক্ষার দারিদ্র, বেড়েছে স্বাস্থ্যের দারিদ্র, বেড়েছে অস্বচ্ছতা-উদ্ভুত দারিদ্র, বেড়েছে নিরাপত্তাহীনতার দারিদ্র, বেড়েছে সাম্প্রদায়িকতা-উদ্ভুত দারিদ্র, বেড়েছে রাজনৈতিক দারিদ্র, বেড়েছে প্রান্তিকতা-উদ্ভুত দারিদ্র, বেড়েছে নেতৃত্বের দারিদ্র, বেড়েছে মানস কাঠামোর দারিদ্র।

গত তিন দশকের শাসক গোষ্ঠি ৭২-এর সংবিধানের মূল চেতনার বিরুদ্ধে অবস্থান নেবার ফলে দেশের জন্য মারাত্মক একটি প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে। যা থেকে বের হয়ে বৈষম্যহীন অর্থনীতি ও অসাম্প্রদায়িক মানস কাঠামো বিনির্মাণ প্রক্রিয়া শুরু করার কাজটি যথেষ্ট দুরুহ। কারণ এ কোন সাধারণ বিচ্যুতি নয়– বিচ্যুতিটি মৌলিক। মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত একটি জনকল্যাণকামী সংবিধানের প্রতি অবিশ্বস্ত-উদ্ভুত বিচ্যুতি। আর এ বিচ্যুতির ফলে প্রথমেই অর্থনীতি দুর্বৃত্তায়িত (criminalization of economy) হয়েছে (হতে বাধ্য হয়েছে)। আর অর্থনীতির দুর্বৃত্তায়ন রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের (criminalization of politics) কার্যকরী চাহিদা বৃদ্ধি করেছে। অতএব অর্থনীতি ও রাজনীতি উভয়ই দুর্বৃত্তায়িত হয়েছে– এ নিয়ে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই। শুধু তাই নয়– এ প্রক্রিয়ায় শাসকশ্রেণীর রাজনীতিবিদরা দুর্বৃত্তায়নের আশ্রয় নিয়েছেন (যারা প্রথমে ছিলেন বেশ ত্যাগী রাজনীতিবিদ তাদের অনেকেই দুর্নীতিবাজ হয়েছেন, অনেকেই ব্যবসায়ী-কাম-রাজনীতিবিদে রূপান্তরিত হয়েছেন); এ প্রক্রিয়ায় দুর্বৃত্তরা নিজেরাই ক্ষমতাসীন রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করেছে এবং রাজনৈতিক নীতি নির্দ্ধারণ, রাষ্ট্রিয় নীতি নির্দ্ধারণসহ রাষ্ট্র-সরকারে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করেছে। অর্থাৎ এক ধরণের দুষ্ট চক্র সৃষ্টি হয়েছে যার যুক্তিগত যোগসুত্রটি নীচের ছকে দেখানো হল:

ছক ১: গত তিন দশকে সৃষ্ট দুর্বৃত্তায়নের রাজনৈতিক-অর্থনীতি

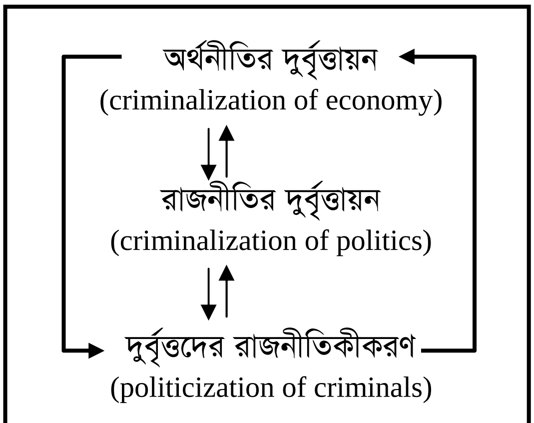

সামগ্রিক এ দুর্বৃত্তায়ন প্রক্রিয়ার প্রতিফল হিসেবে গড়ে উঠেছে এক আত্মঘাতী লুণ্ঠন সংস্কৃতি যেখানে জনকল্যাণ, গণতন্ত্র, সংবিধান, মানব অধিকার কোনটিই কাজ করার কথা নয়; যেখানে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানও কাজ করে না, করার কথাও নয়। আর এ লুণ্ঠন সংস্কৃতির চরিত্র-নিয়ামক হ'ল কালো টাকা, সন্ত্রাস (বাজার সন্ত্রাস পর্যন্ত), ঘুষ, দুর্নীতি, পেশি শক্তি, অবৈধ অস্ত্র, কু-শাসন-অপশাসন-দুঃশাসন, দমন-পীড়ন ইত্যাদি। গত তিন দশকের সামগ্রিক এ দুর্বৃত্তায়ন প্রক্রিয়ায় শাসকদের প্রতি জনগণের আস্থাহীনতা বেড়েছে, সম্মানবোধ কমেছে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সৃষ্টির সকল শুভ উদ্যোগ-প্রক্রিয়া ব্যহত হয়েছে। মানুষ অধিকহারে নিয়তিনির্ভর হয়ে পড়েছে। আর এসব ফাঁকফোকর দিয়ে ঢুকে পড়েছে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা। আর

সে কারণেই মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের বলতে আর কোন বাধা নেই যে তারা বাংলাদেশকে একটি মডারেট মুসলিম স্টেট হিসেবে দেখতে ইচ্ছুক। আর মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী মূল রাজনৈতিক দল জামাত-ই-ইসলামকে তারা ইতোমধ্যে মডারেট ডেমোক্রেটিক মুসলিম দল হিসেবে সার্টিফিকেট প্রদান করেছে (তাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাওয়াত করে)।

মুক্তবাজার অর্থনীতি আর বিকৃত পুঁজিবাদ-এর কাঠামোতে দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন অস্বাভাবিক কোনো বিষয় নয়। বরঞ্চ উল্টো– পুঁজিবাদের মুক্তবাজার অর্থনীতিতে দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। তবে এদেশে এ দুর্বৃত্তায়ন হয়েছে মাত্রাতিরিক্ত। দেশের গুটিকয়েক ব্যক্তি যারা দেশ শাসন করেছেন এবং প্রক্রিয়ায় আমলা, ব্যবসায়ী ও বিদেশী দালালদের সাথে হাত মিলিয়ে সমগ্র দেশ-কাঠামোকে দুর্বৃত্তায়িত করেছে– তারা কাজটি করেছে নির্বিচারে এবং চোখে পড়ার মত রেকর্ড দ্রুততার সাথে– সম্ভবত: এটাই সমস্যা। গত **তিন দশকে** সরকারিভাবে এদেশে যে ২ লাখ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক ঋণ-অনুদান এসেছে তার ৭৫ ভাগই লুট হয়েছে (অর্থাৎ লুট হয়েছে ১.৫ লাখ কোটি টাকা এবং এ লুটের সাথে সংশ্লিষ্ট ১ লাখ লুটেরা); দেশে পুঞ্জিভূত কালো টাকার পরিমাণ হবে আনুমানিক ৭ লাখ কোটি টাকা (যার মধ্যে সম্ভবত ২ লাখ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে); এসব লুটেরারাই বছরে আনুমানিক ৭৫ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ কালো টাকা সৃষ্টি করেন; দেশের প্রায় ২ কোটি বিঘা খাস জমি-জলা (যা দরিদ্র মানুষের ন্যায্য হিস্যা) বেদখল করে আছে এসব লুটেরা এবং তাদের অধঃস্তনেরা; এরাই ৩০ হাজার কোটি টাকার খেলাপি ঋণের অধিকাংশের মালিক; এরাই বছরে ৩০-৪০ হাজার কোটি টাকা অর্থ পাচারের সাথে সংশ্লিষ্ট; এরা এবং এদের সহযোগিরা মিলে মিশে বছরে কমপক্ষে ১০ হাজার কোটি টাকা ঘুষ খান; এদের মধ্যেই আছে তারা যারা ৭৮ লাখ বিঘা শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি জোরদখল করে খাচ্ছেন; এরাই তারা যারা বিগত সরকারের আমলে কৃত্রিমভাবে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে সিণ্ডিকেট পদ্ধতিতে জনগণের কাছ থেকে ২ লাখ ৮৬ হাজার কোটি টাকা লুট করেছে; এরাই তারা যারা অর্থসম্পদ- ভূমি-জল-বন লুট থেকে শুরু করে বিচারের রায় পর্যন্ত প্রভাবান্বিত করে; এবং এরাই তারা যারা ক্ষমতাসীন রাজনীতির নীতি নির্ধারণ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রিয় নীতি নির্দ্ধারণে মূল ভূমিকা পালন করে।

অর্থনীতি ও রাজনীতি সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত অতি-দুর্বৃত্তায়ন ও সংশ্লিষ্ট লুণ্ঠন সংস্কৃতি একটি দেশে রাষ্ট্রক্ষমতা পরিবর্তন বা জরুরি অবস্থা ঘোষণার কারণ হতেই পারে। এ ধরণের অবস্থায় হতেই পারে যে একজন রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধান বা সেনা প্রধান বলবেন দেশের অবস্থা সংকটাপন্ন, বিপদাপন্ন দেশের অর্থনীতি, মানুষ পরিবর্তন চায়। এ কথা ধ্রুব সত্য মানুষ পরিবর্তন চায়। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ দ্রব্যমূল্যের নিরন্তর উর্ধ্বগতি চায় না; মানুষ দুর্নীতি চায় না; মানুষ চায় মানুষের কল্যাণ-উদ্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ যেন সত্যিকার কল্যাণ নিশ্চিত করে (অর্থাৎ মানুষ সংশ্লিষ্ট সংস্কার চায়)। সে কারণেই যারা জরুরি অবস্থা জারী করলেন তারা দেশের জন্য তিনটি প্রধান সমস্যা চিহ্নিত করে সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিলেন, বললেন (১) **দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ করা হবে**, (২) **দুর্নীতি রোধ করা হবে**, (৩) **সংস্কার করা হবে**। এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ আন্তরিকভাবেই সংশ্লিষ্টদের সমর্থন দিলেন। কিন্তু এখন আর সে সমর্থন নেই। কারণ দ্রব্যমূল্য এমন বাড়া বেড়েছে এবং বাড়ছে যা রেকর্ড সৃষ্টি করেছে; দুর্নীতি আসলে হ্রাস পায়নি– বেড়েছে (রেট বেড়েছে এবং ভীতির কারণে বেশি ঘুরতে হচ্ছে); সংস্কার যা হয়েছে তার সুফল দরিদ্র মানুষ কিভাবে পাচ্ছেন বা পাবেন তা কারো কাছে স্পষ্ট নয়। তাহলে অতি সাধারণ প্রশ্ন– জরুরি অবস্থা, সেনা শাসন, সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার কেনো?

এ বিষয়ে আমার রাজনৈতিক-অর্থনীতির ক্ষুদ্র অভিজ্ঞান বলে দুর্বৃত্তায়ন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি জরুরি অবস্থা জারীর আসল কারণ নয়– উপলক্ষ্য হতে পারে। আসল কারণটি সম্পূর্ণ অন্য কোথাও খুঁজতে হবে। আমার ধারণা এক মেরুর পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের ভৌগলিক-আঞ্চলিক দোসররা পৃথিবীকে তাদের মত করে ভাগ-জোক করে নিতে চাইছে। এ প্রক্রিয়ায় তারা– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে এবং বিশ্বব্যাংক, আইএমএফসহ অন্যান্য অধ:স্তন সংস্থার মাধ্যমে– পৃথিবীতে ৩-টি সম্পদের উপর অভিগম্যতা নয় নিরঙ্কুশ মালিকানা/কর্তৃত্ব (not just access but absolute ownership) প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্য অর্জনে তাদের প্রয়োজন নিশ্চিত করা যে পৃথিবীতে একগুচ্ছ দেশ থাকবে যারা সস্তা শ্রম সরবরাহকারী দেশ হিসেবেই থেকে যাবে, যাদের প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলন ও ব্যবহারের যোগ্যতা সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু করতে দেয়া যাবে না, যাদের এমন কিছু করার অনুমতি দেয়া যাবে না যাতে তাদের দাতা-নির্ভরশীলতা হ্রাস পায় এবং /অথবা দাতাদের নির্দেশ অমান্য করার শক্তি সৃষ্টি হয়। এককথায় শিল্পায়িত হতে দেয়া যাবে না অথবা এমন শিল্প বিকাশের অন্যায্য সুযোগ দেয়া হবে যেসব শিল্প পরিবেশ-দূষণ করবে এবং যে শিল্প পণ্যের পশ্চিমা ভোক্তারা যেন কম দামে তা অব্যাহতভাবে ভোগ করতে পারেন। এমতাবস্থায় আমার ধারণা হলো এরকম যে **বাংলাদেশে বাণিজ্য পুঁজি যখনই ধীরে ধীর শিল্প পুঁজিতে রূপান্তরিত হচ্ছিল ঠিক সে সময়েই মাজায় বাড়ি দেয়া হলো**। এটারই অপর নাম ওয়ান-ইলেভেন।

আমার ধারণা– যে সাম্রাজ্যবাদ বাংলাদেশ স্বাধীন হোক এটা চায়নি তারা এবং তাদের সাথে পরিবর্তিত পৃথিবীতে তাদেরই ভৌগলিক/আঞ্চলিক দোসররা কোনভাবেই চান না বাংলাদেশে শিল্প পুঁজি বিকশিত হোক যে পুঁজির বিকাশ দেশকে শিল্পায়িত করবে, ফলে দেশ অর্থনৈতিকভাবে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারবে, ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক রীতি-নীতিসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহও নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যাবে, এবং এ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের দাতা-তোষণ সমীকরণ পরিবর্তিত হয়ে যাবে। তাদের মতে বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়াটা শিল্পায়নমুখী হলে বাংলাদেশের মাজায় জোর বেড়ে যাবে এবং "বেয়াড়া" হয়ে যাবে বাংলাদেশ।

এ কথা সত্যি যে মন-মানসিকতায় যতই আমরা সামন্তবাদী হই না কেন সামন্তবাদ এখানে নিয়ামক উৎপাদন পদ্ধতি নয়। আর সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা বিনির্মাণের আপাতত কোনো সুযোগ-সম্ভাবনা এদেশে নেই (যদিও ৭২-এর সংবিধানে এ প্রতিশ্রুতিই দেয়া হয়েছিলো)। তাহলে যা হতে পারে এবং হচ্ছিল তার নাম পুঁজিবাদ। আর এ পুঁজিবাদ বিকাশের স্বাভাবিক নিয়ম হলো তাকে নিম্নলিখিত ৩টি স্তর পর্যায়ক্রমে পেরুতে হয়:

প্রথম স্তর = পুঁজির প্রাথমিক সঞ্চয়ন (primary accumulation of capital), যেখানে লুণ্ঠন- সন্ত্রাস- দুর্বৃত্তায়ন নিয়ামক ভূমিকা পালন করে;

দ্বিতীয় স্তর = প্রাথমিক পুঁজির বাণিজ্য পুঁজিতে রূপান্তর (transformation of primary accumulation of capital into trade capital), যেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য (অন্যের উৎপাদিত পণ্য কেনা-বেচা থেকে শুরু করে জমি-বাড়ী কেনা) বিকশিত হবে; আর

তৃতীয় স্তর = বাণিজ্য পুঁজির শিল্প পুঁজিতে রূপান্তর (transformation of trading capital into industrial capital)। যেখানে শিল্প পুঁজি সাধারণত: হাল্কা-মাঝারি শিল্প দিয়ে (অনেক ক্ষেত্রে বস্ত্র শিল্প) শুরু হয়ে ধীরে ধীরে ভারি শিল্পের দিকে যায়।

পুঁজিবাদের পুঁজি বিকাশের এ তিন স্তরই বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য: ১৯৫০-এর দশক থেকে বলা যায় এ দেশে প্রাথমিক পুঁজির সঞ্চয়ন প্রক্রিয়াটি শুরু যা যথেষ্ট গতি পেয়েছিলো ১৯৭৬-২০০৫ সাল পর্যন্ত সময়কালে; ১৯৮০-২০০৬ সময়কালে যথেষ্ট দ্রুত হারে প্রাথমিক পুঁজি বাণিজ্য পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়েছে; আর বলা যায় ১৯৯৫-২০০৬ সময়কালে ধীর গতিতে বাণিজ্য পুঁজি শিল্প পুঁজিতে রূপান্তরিত হচ্ছিল এবং প্রবণতাটি ছিল যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক। **ঠিক শেষোক্ত এ সময়কালটিকেই বেছে নেয়া হলো যেন এ দেশে শিল্প পুঁজি বিকশিত হতে না পারে।** এ প্রক্রিয়ায় সংবিধানে নির্দেশিত "মালিকানার নীতি" (অনুচ্ছেদ ১৩) সম্পূর্ণ লজ্ঘন করে সরকারি মালিকানাধীন ভারি শিল্প বন্ধ করা হলো, পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পাটকল আদমজী বন্ধ করা হলো, সরকারী মালিকানাধীন পাট-বস্ত্র শিল্পসহ অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠান হয় বন্ধ অথবা বেসরকারিকরণ করা হলো, এবং সরকারি ব্যাংক বেসরকারীকরণ করা হলো। আর এ সবকিছুই হলো সাম্রাজ্যবাদের অধস্তন দাতাগোষ্ঠির নয়া উদারবাদী দর্শনের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী যেখানে বলা হলো বাংলাদেশে শিল্পায়নের কোনো তুলনামূলক সুবিধে নেই। তাহলে একথা তো স্পষ্ট যে এদেশে শিল্প পুঁজির বিকাশ হতে দেয়া যাবে না এবং পুঁজি বিনিয়োগকারীদের মধ্যে এমন "ভীতি পরিবেশ" সৃষ্টি করা হবে যাতে তারা ভবিষ্যতেও শিল্প বিনিয়োগের দিকে না ঝুঁকে পড়েন। দেশে জরুরি অবস্থা জারীর সাথে এসবের কোনো সম্পর্ক নেই– তা কি প্রমাণ করা যাবে?

তাহলে এখন কি করা?

দেশ যে পথে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে– সেটাই যদি পথ হয়ে থাকে তাহলে অধিকতর বিপর্যয় অনিবার্য। বাংলাদেশকে বাঁচাতে হবে; বাঁচাতে হবে এ দেশের দুঃখী মানুষকে। মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত বৈষম্যহীন অর্থনীতি আর অসাম্প্রদায়িক মানস কাঠামো সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতেই হবে। এ দেশের মানুষ নিরক্ষর হতে পারে তবে তারা ভাল-মন্দের বিচার করতে শিখেছেন এবং তা বহুবার প্রমাণও করেছেন। এ দেশের কৃষক পরমুখাপেক্ষী না হয়ে সার-ডিজেল-বীজ-এর ঊর্ধ্বমূল্যের বাজারেও জমি চাষ করে নিজে নিরন্ন থেকে আমাদের সবার অন্ন যোগান দিয়ে যাচ্ছেন (যা সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব ছিল); এ দেশের শ্রমিক মানবেতর স্বল্প মজুরীর বিনিময়ে কোন ধরনের খেদ প্রকাশ না করেই শিল্প প্রতিষ্ঠানে সম্পদ সৃষ্টি করে যাচ্ছেন; এ দেশের প্রায় ২০ লাখ মহিলা বছরে ২৮০ কোটি কিলোমিটার হেঁটে দৈনিক ১২-১৪ ঘন্টা পরিশ্রম করে তৈরি পোশাক শিল্পে স্বল্পতম মজুরীর বিনিময়ে কাজ করে বৈদেশিক মুদ্রা এনে দিচ্ছেন; এ দেশের গ্রামের মানুষ ভিটে-বাড়ী বিক্রি করে মধ্যপ্রাচ্যে কঠোর কায়িক শ্রম দিয়ে দেশে বছরে কমপক্ষে ৬ বিলিয়ন ডলার পাঠাচ্ছেন; এ দেশের গ্রামের মানুষ গলাধাক্কা অভিবাসন-এর কারণে শহরে এসে অনানুষ্ঠানিক সেক্টরে প্রায় বিনা মজুরিতে পরিবার পরিজনসহ অভুক্ত-অর্ধভুক্ত অবস্থায় দিনাতিপাত করছেন। এসব মানুষই তো দেশের ৮০-৮৫ ভাগ মানুষ। এ মানুষ সোনার মানুষ। কারণ তারা এত কিছুর পরেও বিক্ষুব্ধ নন অথবা এখনও প্রকাশ্যে বিক্ষোভ প্রকাশ করেননি। এসব মানুষকে মানুষ হিসেবে গণ্য করার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। মানবিক এ উন্নয়ন নিশ্চিত করার দায়িত্বটা আমাদের সবার-সম্মিলিত।

এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে বড় মাপের ঐতিহাসিক বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। যা কোনোভাবেই ঘটতে দেয়া যাবে না। ক্ষতি যা হবার তা তো হয়েই গেছে। ক্ষতি আর বাড়ানোর দরকার নেই। সুতরাং আসুন আসন্ন ক্ষতি হ্রাস কৌশল (immediate strategy for minimizing damage) হিসেবে সংশ্লিষ্ট সবাই আলোচনায় বসি। এর নাম সংলাপ হতে পারে। অতীতকালে সংলাপ বিষয়টি খুব একটা কাজ করেনি। তবে সংলাপ তখনই কাজ করে যখন পক্ষসমূহের সম্মত হবার প্রস্তুতি থাকে। দেশের স্বার্থ- দেশের মানুষের স্বার্থ মাথায় রেখে সংশ্লিষ্টরা সংলাপে বসুন। সংলাপে ক্ষুদ্র ব্যক্তি স্বার্থ বর্জন করুন।

'রোড ম্যাপ' জাতীয় শব্দ-বাক্য খুব দরকার নেই। যা দরকার তা হলো এ বছরের শেষের দিকেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক এবং তা হতে হবে সর্বোচ্চ মাত্রায় স্বচ্ছ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, অবাধ, মুক্ত। আর নির্বাচনে যারা অংশগ্রহণ করবেন তার যেন চিন্তা-ভাবনায় এমন আলোকিত মানুষ হন যারা মানুষের জন্য কাজ করবেন (ব্যক্তি স্বার্থ কম দেখবেন)। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলসমূহ তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে মিথ্যা কথা যেন না লেখেন অথবা এমন কিছু না লেখেন যা করতে পারবেন না; ইশতেহারে স্পষ্ট করে বলবেন যে– যে চেতনা থেকে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঐ চেতনা ধারণ এবং ১৯৭২-এর মুল সংবিধানের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে বৈষম্যহীন অর্থনীতি ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে "দেশের মাটি উত্থিত উন্নয়ন দর্শন" প্রণয়ন করবেন এবং তা বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেবেন। আপনারা আপনাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং নির্বাচনি ইশতেহারে বলুন আপনারা ১৯৭২-এর সংবিধানের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে অর্থনৈতিক-সামাজিক এক শক্তিশালী বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে (অন্যান্য কাজের মধ্যে) নিম্নলিখিত কাজগুলো করবেন: আপনারা সংবিধানে বিধৃত "মালিকানার নীতি" (অনুচ্ছেদ ১৩) অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় মালিকানা[৩], সমবায়ী মালিকানা, এবং ব্যক্তি মালিকানার এমনতর বিকাশ সাধন করবেন যার ফলে এ দেশের প্রতিটি মানুষ যেন বিকশিত হবার সম-সুযোগ পায়; আপনারা দেশের সকল সম্পদের (মানব ও প্রাকৃতিক) complete and comprehensive inventory প্রণয়ন করে জ্ঞান-ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা ও বাস্তবায়ন করবেন (কিভাবে এসব করবেন তা স্পষ্ট করুন); আপনারা কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার করবেন; আপনারা শিল্প পুঁজির বিকাশ ত্বরান্বিত করবেন (বিকেন্দ্রিয়ায়িত; ক্ষুদ্র-মাঝারি স্বকর্মসংস্থানভিত্তিকসহ বৃহৎ শিল্প); আপনারা ২০২০ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ প্রাপ্তি নিশ্চিত করবেন (এটাও সাংবিধানিক দায়িত্ব, অনুচেছদ ১৬); আপনারা শিক্ষা-স্বাস্থ্যসহ উৎপাদনশীল খাতসমূহকে উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেবেন; আপনারা স্থানীয় শাসন ব্যবস্থাকে সংবিধান অনুযায়ী উন্নয়নের মূল একক হিসেবে দেখবেন; আপনারা সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয়-আশ্রয় দেবেন না; আপনারা দাতা-নির্ভরতা কমাবেন; এবং সকল কর্মকাণ্ডে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

নির্বাচনে জিতে একপক্ষ সরকার গঠন করবেন আর অন্যপক্ষ সংসদে বিরোধীদলের ভূমিকা নেবেন। দুপক্ষকেই জনগণের কাছে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যেন অতীতের হিংসাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি আর না থাকে– মানস কাঠামোর পরিবর্তনটা সহজ নয় তবে এ পরিবর্তন জরুরি। অন্যথায় গণতন্ত্র কাজ করবে না। আবারও পুনরাবৃত্ত হবে অনাকাঙ্খিত অতীত। মনে রাখা জরুরি যে সংসদে পক্ষ-প্রতিপক্ষ ব্যাপারটি আসলে দুপক্ষের ব্যাপার নয়– আসলে দুপক্ষ মিলেই **দেশের মানুষের পক্ষে** নীতি-নির্ধারণ করেন এবং দেশ-সরকার পরিচালনা করেন। সম্ভবত এটাই গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র। সব শুরুরই তো শেষ আছে। আসুন সবাই মিলে জাতীয় সংকটটা উত্তরণে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিই। এ প্রচেষ্টা থেকে নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসবে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব এবং নিশ্চিত হবে দেশ বিনির্মাণ প্রক্রিয়ায় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ।

---

[৩] সাম্রাজ্যবাদ আর বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ যে নয়া উদারবাদী উন্নয়ন দর্শন আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে সেখানে বলা হয়ে থাকে যে রাষ্ট্রায়ত্ব খাত মাত্রেই অযোগ্য-স্বল্প উৎপাদনক্ষম-অকার্যকর। সুতরাং বিরাষ্ট্রিকরণ/রাষ্ট্রায়ত্বখাতের ব্যক্তি মালিকানাকরণ সমস্যার সমাধান; সেই সাথে তারা এও বলে যে সরকারি বাজেট বরাদ্দ হ্রাস করতে হবে– ব্যক্তিখাতই সবকিছু দেখবে এবং তাতে ভাল ফল পাওয়া যাবে। নয়া উদারবাদী অর্থনীতির এসব উন্নয়ন প্রেসক্রিপশন আসলেই ভ্রান্ত। এমর্মে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া প্রয়োজন বোধ করছি: ঐতিহাসিকভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কন্টিনেন্টাল ইউরোপ এবং জাপানের অর্থনীতির সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৯৬০-এর দিকে যখন সরকারী বাজেট বরাদ্দও ছিল অত্যুচ্চ– ১৯৬০ সালে সরকারি ব্যয় বরাদ্দ– জিডিপি অনুপাত ছিল সুইডেনে ৩২.২%, জার্মানীতে ৩২.৪%, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২৭.২%, যুক্তরাজ্যে ৩২.২%। আর ইদানিং এ হার এসব দেশে বেড়েছে: ১৯৯৯ সালে এ হার সুইডেনে ৫৫.১%, জার্মানীতে ৪৪.৮%, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৩২.৭%, আর যুক্তরাজ্যে ৩৭.৮%। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো, প্রযুক্তি, যোগাযোগসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট খাতে সরকারি ব্যয়-বরাদ্দ বৃদ্ধি তো ব্যক্তি মালিকানাধীন খাতের বিকাশের সুস্পষ্ট পূর্বশর্ত। আসলে উচ্চ হারের সরকারি ব্যয়-বরাদ্দ ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগের তুলনায় নিকৃষ্টও নয় এবং তা ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগকে অনাকর্ষণীয়ও করে না। (বিস্তারিত দেখুন: Ha-Jaon Chang and Ilene Grabel. 2005. Reclaiming Development: An Alternative Economic Policy Manual. Zed Books: PP.193-195)।